যারা শিক্ষাকে সংকুচিত করছে
মিটিং-মিছিল বন্ধের ফতোয়া দিচ্ছে তারাই

সরকারি ফতোয়া— কলেজ স্কোয়ারে মিটিং-মিছিল করা যাবে না। প্রশাসনিক সভার নামে সরকারি টাকায় দলের নেতা-কর্মীদের এক সভায় তৃণমূলের এক ছাত্র নেতার প্রস্তাবে মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ বোধোদয় হয় যে, কলেজ স্কোয়ারে মিটিং-মিছিলে ছাত্র-ছাত্রীদের নাকি লেখাপড়ার অসুবিধা হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে নাটকীয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবটাই সাজানো, গটআপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অনেকদিন ধরেই বিষয়টা ভেবেছি, কিন্তু কে কী ভাববে তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। এ কথার মানে দাঁড়ায় 'কে কী ভাববে' এ নিয়ে তিনি আর এখন ভাবেন না। দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনে জিতে ওঁনার মনে হয়েছে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন! যেমনটা এক সময় পূর্বতন সিপিএম সরকারের মন্ত্রীরা ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করতেন না। আজ তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গিও একইরকম।

ঐতিহাসিক কলেজ স্কোয়ার বহু মনীষীর স্মৃতি বিজড়িত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত, সমাজ প্রগতির আন্দোলনের বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই কলেজ স্কোয়ার। '৫০-'৬০-এর দশকের খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম' আন্দোলন— সবটার সাথেই জড়িয়ে আছে কলেজ স্কোয়ারের নাম। এখানেই নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে গৃহীত হয়েছে ঐতিহাসিক ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচি। যার ফলে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালু হয়েছে।

ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে একের পর এক অসংখ্য মিটিং-মিছিল, অবস্থান এই কলেজ স্কোয়ারে হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক শিক্ষাব্রতী ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ, মানিক মুখার্জী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শৈলেশ দে, বাণী রায়, প্রতিভা বসু, গৌরী আয়ুব প্রমুখ। সেদিন কলেজ স্কোয়ারে মিছিল-মিটিং-এ লেখাপড়ার ক্ষতির প্রশ্ন ওঠেনি, বরং শিক্ষা বাঁচানোর স্বার্থেই প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে সকলে এগিয়ে এসেছিলেন। আজ যারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে, শিক্ষার স্তরে স্তরে ফি বাড়িয়ে, বেসকারিকরণ করে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করছে, তারাই বলছে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে মিছিল মিটিং হলে। তারা কি সত্যিই চায় শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকুক? সকলে শিক্ষা পাক? যদি চাইতো তা হলে তো এতো দীর্ঘ টালবাহানা না করে তারা পাশ-ফেল চালু করত, বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় উৎসাহ না দিয়ে সরকারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলত, হাজার হাজার শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করত। কিন্তু তা না করে শিক্ষার স্বার্থের নাম করে মিছিল-মিটিং বন্ধ করতে চাইছে কেন?

আসলে, শাসকের ধর্মই তাই। সে চায় না তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ হোক। একদিকে প্রতিবাদ-আন্দোলন হলে লাঠি-গুলি চালিয়ে তা দমন করে, অপরদিকে আন্দোলনের সমস্ত পরিসর সে বন্ধ করে দিতে চায়, সংকুচিত করে দিতে চায় গণতন্ত্রের পরিধি। এক সময় প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু কলকাতাকে 'মিছিল নগরী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' আখ্যা দিয়েছিলেন। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার নৃশংস বর্বরতায় সেদিন আন্দোলন দমন করেছে। একই ধারাবাহিকতা সিপিএম সরকারের আমলেও। রাজ্য জুড়ে আন্দোলন দমনের নামে পুলিশ ও শাসক দলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতে কত মানুষ যে নিহত-আহত-পঙ্গু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ২০০৩-সালে সিপিএম সরকার প্রস্তাব আনে কলকাতার নির্দিষ্ট মাত্র তিনটি জায়গায় মিটিং করা যাবে, মিছিল হবে রাস্তার এক ধার দিয়ে ছুটির দিনে। পশ্চিম বাংলার সংগ্রামী চেতনার মানুষ সেদিন এ প্রস্তাব মানেনি। আজ আবারও মিটিং-মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা। বেকারি, অনাহার, অশিক্ষায় জর্জরিত মানুষ যখন বারবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তখন আইন করে প্রতিবাদের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আন্দোলন দমনের এই অপচেষ্টা ইতিপূর্বেও বহু হয়েছে, ভবিষ্যতেও হয়তো আরও হবে, কিন্তু মনে রাখা দরকার, শেষ কথা বলে জনগণ। যুগ যুগ ধরে রাষ্ট্র রক্ষায় আইন হয়েছে, আবার আইন অমান্যও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে ন্যায়ের, সত্যের। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে যে প্রতিবাদ উঠেছে, তার সামনে সরকার আপাতত এক পা পিছু হঠেছে ছুটির দিনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে। এটাই সব নয়, নিষেধাজ্ঞা পুরো তুলে নেওয়া পর্যন্ত চলবে আন্দোলন।